



প্রশ্নউত্তর

=====

প্রশ্নঃ আমরা শুনে থাকি, আবার একদিন বিশ্বময় ইসলামী শাসন কায়ম হবে। যিনি এর নেতৃত্বে থাকবেন তার নাম হবে ইমাম মাহদী (আলাইহির রেওয়ান)। আমার জিজ্ঞাসা হলো ইমাম মাহদী কি কোন পিতা-মাতার সন্তান হবেন না আল্লাহ তাকে সরাসরি আকাশ থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। যদি তিনি কোন পিতামাতার সন্তান হন তবে তাদের নাম কি হবে। ইমাম মাহদী কত বছর বয়সে দাজ্জালের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবেন। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন, কোথায় ইমাম রূপে প্রকাশিত হবেন এবং কত বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করবেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ। ইমাম মাহদী (আলাইহির রেওয়ান) পিতা-মাতার সন্তান হবেন। স্বাভাবিক নিয়মে মায়ের উদর থেকে তিনি জনগ্রহণ করবেন। সহীহ হাদীসের আলোকে সকল আহলে হক এ কথার ওপর একমত যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর নসলে তার জন্ম হবে। তীর পিতা-মাতা উভয়ের বংশ হবে সায়েদ। তীর নাম হবে মুহাম্মাদ, পিতার নাম হবে আব্দুল্লাহ এবং মায়ের নাম হবে আমেনা।

অনেক ক্ষেত্রে পুত্র যেরূপ পিতার চরিত্রে শুশোভিত হয় ইমাম মাহদী অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত হবেন। তবে তিনি নবী হবেন না। তার ওপর ওহী নাযিল হবে না।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে ইঙ্গিত হয়েছে, পবিত্র মদীনা তাঁর জন্ম হবে এবং সেখানেই তিনি লালিত-পালিত হবেন। মক্কা মুকাররামায় তাঁর নিকট লোকেরা খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করবে। কোন এক পর্যায়ে তিনি হিজরত করে বাইতুল মুকাদ্দাস চলে যাবেন।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যখন তীর হাতে মুসলিম জনতা বাইয়াত গ্রহণ করবে তখন তার বয়স হবে চল্লিশ বছর। তার খেলাফতের সপ্তম বছর কানা দাজ্জালের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। তীর সাথে কাফির বাতিল শক্তি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে থাকবে। এক পর্যায়ে মাহদী তীর সৈন্য বাহিনীসহ দাজ্জালের নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাবাহিনীর বেষ্টনির মধ্যে বন্দী হয়ে পড়বেন। এই মুহূর্তে ঠিক ফজরের নামাযের সময় দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। ওই ওয়াক্তের ফজরের নামায তিনি মাহদী (আলাইহির রেওয়ান)-এর ইমামতীতে আদায় করবেন। নামায শেষ করে তারা দাজ্জালের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বের হবেন। দাজ্জালও শক্ত পায়ে তাদের মোকাবিলা করতে উদ্যত হবে। পরিশেষে বাবে লুদ নামক স্থানে তার তীক্ষ্ণ বর্শার আঘাতে দাজ্জালের প্রাণ নাশ ঘটবে। এর পর থেকে তাদের হাতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের ঘাটি ও কেন্দ্রগুলোর একটি একটি করে পতন ঘটতে থাকবে। তাদের নেতৃত্বে তখন আরেকবার বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় ঘটবে। ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে ইমাম মাহদী ইন্তেকাল করবেন।

প্রশ্নঃ হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর শহীদ হযরত মাওলানা এরশাদ আহমাদ (রাহঃ)-এর বিস্তারিত জীবনী জানতে চাই।

উত্তরঃ আফগান জিহাদে বহিরাগত হিসাবে যারা অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে শহীদ এরশাদ আহমাদ (রাহঃ) ছিলেন একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সাধারণ মুজাহিদই ছিলেন। একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন বটে।

বর্বর রুশরা ১৯৭৯ ইং আফগানিস্তানে হানা দিয়ে নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে যেকোন হত্যা ও অমানবিক অত্যাচারসহ ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছিল তা দেখে এরশাদ আহমাদ (রাহঃ)-এর ঈমান দীপ্ত কোমল হৃদয় দারুণভাবে আহত হয়। তিনি ভীকরদের মত করুণার চোখে তাকিয়ে সামান্য দুঃখ প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ বলে না ভেবে হানাদার রুশদের মুকাবিলায় অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮০ থেকে তিনি আফগান মুজাহিদদের সাথে কাঁধে কীধ মিলিয়ে জিহাদ করতে থাকেন।

এই তৎপরতাকে আরও ব্যাপক ও সুসংহত করার লক্ষ্যে তাঁর নেতৃত্ব ১৯৮২ সালে হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামীর জন্ম হয়। আফগান জিহাদে অংশ গ্রহণকারী পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী মুজাহিদদের এটি একটা ময়বুত প্লাট ফরম। শহীদ আব্দুর রহমান ফারুকী (রাহঃ) ছিলেন এই সংগঠনেরই চীফ কমান্ডার।

এরশাদ আহমাদ (রাহঃ) ১৯৫১ সনের ৫ই জুন পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নেন স্থানীয় স্কুল এর জামেয়া কামেয়মিয়া ফয়সালাবাদে দু'বছর। দারুল উলুম পিপলস কলোনী ফয়সালাবাদে কিছুদিন এবং কুন্দিয়া শরীফ হযরত মাওলানা কান মুহাম্মাদ সাহেবের মাদ্রাসায় দু'বছর পড়াশুনা করেন। জামেয়া রশিদিয়া সাহিওয়াল এ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্তে আরও দু'বছর কাটান। অতপর পাকিস্তানে বিখ্যাত কওমী প্রতিষ্ঠান জামেয়াতুল উলুম আল-ইসলামিয়া আল্লামা বিননুরী টাউন করাচীতে ১৯৭৯ সনে দাওরা হাদীস শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই শিক্ষা বছরেই তিনি ১৯৮০-এ ১৮ই ফেব্রুয়ারী আফগান জিহাদে চলে যান। পরবর্তী বছর জামেয়া রশিদিয়া সাহওয়াল থেকে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার চূড়ান্ত পর্ব দাওরা হাদীছে পরীক্ষা দিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

আফগানিস্তানের বহু অপারেশনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। একাধিক জিহাদে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিহাদের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ সফরটি ছিলো ১৪০৫ হিজরীর ৬ই শাওয়াল। আমীর এরশাদ আহমাদ (রাহঃ) সহ ৪৫ জন মুজাহিদ বিশিষ্ট এই কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা ঈদ মুহাম্মদ। একটি ট্রাকটর ট্রলিতে করে প্রয়োজনীয় রসদসহ তারা পাকতিয়া ও গজনির মধ্যদিয়ে শিরানার পথে রওয়ানা হন। পথে মাগরীবের নামায আদায় করে আবার পথ চলা শুরু হয়। কিন্তু শত্রু বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নিদৃষ্ট স্থানে পৌছা খুব কঠিন বিধায় তারা রাত দশটা পর্যন্ত একস্থানে অবস্থান নেয়। পথে কোন অসুবিধা থাকলে তা তৎক্ষণাৎ অবহিত করার জন্য স্থানে স্থানে পূর্ব থেকে লোক নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু তাদের পৌছতে দেরী হওয়ায় পাহারা তুলে সবাই চলে যায়।

শত্রু বাহিনীর গুপ্তচর তাদের সংবাদ জেনে তা রুশবাহিনীকে অবহিত করলে তৎক্ষণাৎ মুজাহিদ বাহিনীর ওপর সাড়াশি আক্রমণ করার জন্য তারা সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখে। মুজাহিদ কাফেলা নিদৃষ্ট স্থানে পৌছে দেখে, তাদের একজন পাহারাদারও নেই। তীদের পৌছতে দেরী হওয়ায় তারা সকলে চলে গেছে। এই সুযোগে শত্রুবাহিনী তাদের অবস্থান স্থালের বিশ মিটার দূরে এসে অবস্থান নেয়। শত্রু যে এত কাছে মুজাহিদরা তা

অনুমান করতে পারেনি। আনুমানিক রাত সাড়ে দশটার সময় মুজাহিদদের গাড়ীর ওপর শত্রুর একটি বোমা এসে বিস্ফোরিত হয়। যার ফলে গাড়ীর ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। এর পরই শুরু হয় শত্রুপক্ষের বৃষ্টির মত গোলা নিক্ষেপের পালা। এভাবে পনের মিনিট চলে। এই সময়ের মধ্যে গুলি বোমা ও গ্রেনেট এত পরিমাণে নিক্ষেপ করা হয়েছে যে, একজন মুজাহিদও বেঁচে থাকার কথা নয়। উপরন্তু গাড়ীতে থাকাও সম্ভব নয়। সমস্ত গাড়ীতে আগুন জ্বলছে। এই আলো চিহ্নিত করে ওরা ওদের আক্রমণের ধারা আরও তীব্র করে।

তবে মুজাহিদরা দমিত না হয়ে শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য পজিশন নেয় এবং শত্রুর ওপর গুলি করতে থাকে। এক পর্যায়ে শত্রুর একটি গুলি আমীর এরশাদ আহমাদ (রহঃ) এর ঠিক বুকের মাঝখানে এসে বিদ্ধ হয়ে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই অবস্থায়ও তিনি সাথীদের দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করার জন্য উৎসাহিত করছিলেন। তিনিও তার বন্দুক দিয়ে গুলির প্রতি গুলি ছুড়ছিলেন। বার বার তাকবীর ধ্বনি তুলে মুজাহিদদের মনে শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। এদিকে তার শরীর থেকে রক্ত ঝড়ে জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। জীহাদের ময়দানে তিনি চীর নিদ্রায় ঢলে পড়েন।

শহীদ (রাহঃ) প্রায়ই বলতেন, আমি যদি জিহাদের ময়দানে শহীদ হই তাহলে আমার লাশ বাড়ী নিয়ে আসবে না। বরং সব হলে ময়দানে আরও সামনে অগ্রসর হয়ে আমাকে দাফন করবে। তীর এই অসিয়ত ও ওই এলাকার লোকদের অনুরোধে পাকতিয়ার শারানা শহরের নিকটে 'কোর্ট ওয়াল' স্থানে তাকে দাফন করা হয়। এই জিহাদে বাংলাদেশী মুজাহিদ হাফেজ কামরুজ্জামানও শাহাদাত বরণ করেন। এদের সকলকে একই স্থানে দাফন করা হয়েছে। এলাকার লোকেরা শহীদদের এই কবরস্থানকে বাগে জান্নাত" বলে অবিহিত করে। তাদের শাহাদাতের তারিখ হলো ২৫ জুন ১৯৮৫।

এই জিহাদে বাইশ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। আর শত্রু সৈন্য নিহত হয় পঁয়ত্রিশ জন।

প্রশ্নঃ ওহাবী ও সুন্নী কাদেরকে বলে এবং আমাদের দেশে কোন ওহাবী আছে কি?

উত্তরঃ ওহাবীকে সুন্নী থেকে আলাদা কোন মতবাদ বলে মনে করার কারণ নেই। যাদেরকে ওহাবী, বলা হয় তারা আসলেই সুন্নী। মূলত ওহাবী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া একটা অর্থহীন অপবাদ। অষ্টাদশ শতকে আরবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব নজদী নামক একজন সংস্কারকের আবির্ভাব হয়। গোর-পূজাসহ নানা প্রকার গোমরাহি ও বেদায়াতের মধ্যে পতিত মুসলমানদের প্রকৃত হেদায়াতের পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তিনি ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন।

কিন্তু তিনি ইংরেজদের ঘোর শত্রু থাকার কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে থাকে। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে সৈয়দ আহমাদ শহীদ কর্তৃক পরিচালিত জিহাদ আন্দোলনকেও ইংরেজরা ওই একই কারণে ওহাবী নামে প্রচার করার চেষ্টা করেছে। তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জন্য ওরা এক শ্রেণীর ধামাধরা আলিম ও পীর পর্যন্ত নিয়োজিত করেছিলো। ইংরেজরা বহু আগে এদেশ থেকে চলে গেছে। সৈয়দ আহমাদ শহীদ ও আব্দুল ওহাব নজদীর আন্দোলনের যথার্থতা আজকের শিক্ষিত মুসলমানরা উপলব্ধি করতে পারছেন, কিন্তু একশ্রেণীর লোক কোন কিছু না বুঝে চিন্তা না করে স্বাধীনচেতা, সংস্কারবাদী, হক্কানী আলিমগণকে এখনও ওহাবী নামে অভিহিত করছে। যা দুঃখজনক বই কি?

ওহাবী যেহেতু আলাদা কোন মতবাদ নয় তাই কেউ নিজেকে ওহাবী বলে দাবী করে না। তাই এদেশেও কোন ওহাবী নেই।

আর আহলে সুনাত ওয়াল জামায়াতের আকীদায় যারা বিশ্বাসী তারাই সুন্নী। এদেশের এক প্রকার বেদায়াতী আছে যারা নিজেদেরকে সুন্নী বলে দাবী করে। আসলে তারা হয়ত ভণ্ড না হয় চরম গোমরাহীর মধ্যে নিপতিত।
